জাহিলিয়া যুগে আরব

ইউনিট ২

ভূমিকা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে আরবসহ সমগ্র বিশ্ব ছিল জাহিলিয়ার ঘোর তমাসায় আচ্ছন্ন। এ যুগে আইন-কানুন, নীতি নৈতিকতা, শিক্ষাসংস্কৃতি, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি, মানবতাবোধ, ধার্মিকতা, শুদ্ধতা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি ছিল না। সর্বক্ষেত্রেই সর্বগ্রাসী বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। ইসলামের আবির্ভাবে এ ভুবনব্যাপী অমানিশার অবসান ঘটে এবং সত্যিকার সুন্দর প্রভাতের আলোকচ্ছটায় আরবসহ বিশ্বজাহান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই পাঠের ইউনিটসমূহ

পাঠ ২.১: জাজিরাতুল আরব: পরিচিতি ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ ২.২: আইয়ামে জাহিলিয়া
পাঠ ২.৩: জাহিলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
পাঠ ২.৪: জাহিলিয়া যুগে আরবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা
পাঠ ২.৫: জাহিলিয়া যুগে আরবের ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ-২.১ জাজিরাতুল আরবঃ পরিচিতি ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- আরব দেশ তথা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপদ্বীপ জাযিরাতুল আরব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আরবদের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরবের আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**জাযিরাতুল আরব, আরবে বায়েদা, আরবে আরবা, হিজায ও যাযাবর**

আরবের অবস্থান ও আয়তন

ইসলামের জন্মভূমি আরব দেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপদ্বীপ। এটি এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। আরবের উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এটি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। তাই আরবের মক্কা নগরীকে 'উম্মুল কুরা' বা আদি নগরী বলা হয়েছে। তদানিন্তন আরবের আয়তন ছিল ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল। আয়তনে এটি ইউরোপের একচতুর্থাংশ এবং আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ। উত্তর আরবের সামান্য কিছু স্থানে মরূদ্যান আছে, সেখানে লোকবসতি গড়ে ওঠে। এছাড়া প্রায় সমগ্র আরব অঞ্চল মরুময়। হিজায, নজ্‌দ্ এবং আল্-হাস্‌সা প্রদেশ নিয়ে আরব দেশ গঠিত। হাদ্‌রামাউত, ইয়েমেন ও ওমান নিয়ে দক্ষিণ আরব গঠিত। এ এলাকা উর্বর এবং প্রাচীনকালে এটিকে Arabia Felix বা সৌভাগ্য আরব বলা হতো।

আরবের নামকরণ

আরবকে কেন আরব নামকরণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। প্রসিদ্ধ কয়েকটি মতামত নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. আরব শব্দটির অর্থ হলো 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুন্দর ভাষায় কথা বলা'। যেহেতু আরবের অধিবাসীরা নিজেদের ভাষা ও পাণ্ডিত্যের সম্মুখে সমগ্র পৃথিবীর লোককে 'আজমী' (মূক, বোবা) বলে ভাবতে, এজন্য তারা নিজেদের আরব বা আরবি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে আজম বা আজমি অর্থাৎ কথা বলতে অক্ষম বলে মনে করতো। ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাদের আরব বা আরবি নাম ডাকতে শুরু করে। ফলে তারা 'আরব' নামে পরিচিতি লাভ করে।

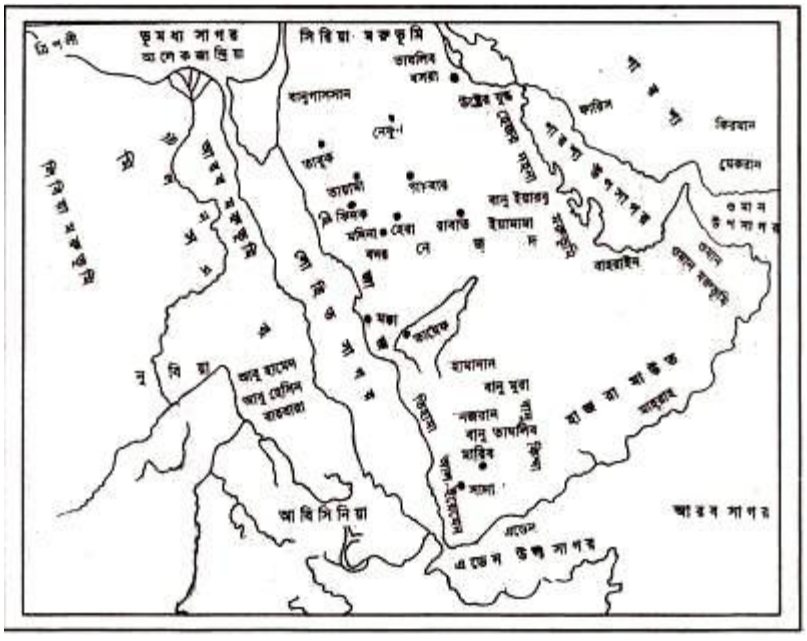

চিত্র: হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সময় আরব

২. 'আরব' শব্দটি 'আল-আরবাতু' থেকে নির্গত হয়েছে যার অর্থ হলো 'লতাগুল্মহীন মরুভূমি'। যেহেতু এ অঞ্চল বৃক্ষলতাহীন মরুভূমি। তাই এ অঞ্চলটিকে আরব নামকরণ করা হয়েছে।

আবহাওয়া

আরব দেশের তিন দিক সাগরবেষ্টিত থাকার কারণে একে আরব উপদ্বীপ বা 'জাযিরাতুল আরব' বলা হয়। আরবে কোনো নদ-নদী নেই। অধিকাংশ অঞ্চলের আবহাওয়া গরম ও শুষ্ক। উচ্চভূমিতে গরমের সময় রাত নাতিশীতোষ্ণ হয়ে থাকে। শীতকালে কোনো কোনো সময় তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নিচে নেমে যায়। আরবের পূবালি হাওয়া অতীব আরামদায়ক। আরবের প্রাচীন কবিগণ তাঁদের রচিত কবিতায় পুবালি হাওয়ার প্রশংসা গেয়েছেন। আরবের একতৃতীয়াংশ মরুময় প্রকৃতির রুদ্রলীলাস্থল এবং মনুষ্য বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, শুষ্ক ও নিষ্করণ রৌদ্রতাপ পীড়িত, বৃক্ষলতাদিশূন্য এবং সেখানে লু-হাওয়া প্রবাহিত হয়। তবে ওমান, ইয়েমেন, তায়েফ ও মদিনায় বছরে দু'বার বৃষ্টিপাত হয়। এ সকল অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ও আবহাওয়া মোটামুটি ভালো।

উৎপন্ন দ্রব্য : আরব দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে প্রধান হলো খেজুর। তৎকালীন আরবে খেজুর গাছকে Queen of the trees বা 'গাছের রাণী' বলে অভিহিত করা হতো। এ গাছ ধনী-দরিদ্র সকলের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিল। খেজুর ব্যতীত আরবদের জীবন কল্পনাই করা যেত না। আরবের উপকূল এলাকায় ফলমূল ও শাকসবজি জন্মাত। সেকালে ইয়েমেন সর্বাপেক্ষা উর্বর প্রদেশ ছিল। তথায় গম ও কফি অত্যধিক ফলত। আম্মান প্রদেশের কোনো কোনো এলাকায় ধানেরও আবাদ হতো। হাদরামাউত ও মিহ্‌রা নামক স্থানদ্বয় গুল এবং ধুনট গাছ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। আরব বিস্তীর্ণ মরুভূমির দেশ হলেও এর বিভিন্ন স্থানে সবুজ-শ্যামল দৃশ্য চোখে পড়ত। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থিত দোয়া-"হে আমার প্রভু! তুমি এ (আরব) নগরীকে নিরাপত্তার স্থান বানিয়ে দাও এবং এর অধিবাসীদের ফলফলারি থেকে রিযিক দান কর।"(সুরা বাকারাহ,২:১২৬)

জীবজন্তু : অনেক প্রাচীনকাল থেকে আরবে উট, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ও দুম্বা গৃহপালিত জন্তু হিসেবে সমাদৃত ছিল। আরবের বন্য জন্তুর মধ্যে হায়েনা, বাঘ, সরীসৃপ ও খেঁকশিয়াল প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। কবুতর, বাজপাখি, ঈগল, হুদহুদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পাখিও আরবে বিদ্যমান ছিল। জীবজন্তুর মধ্যে উট এবং বৃক্ষের মধ্যে খেজুর গাছ আরববাসীর নিকট অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। মরুজীবনের একমাত্র সহায়-সম্বল ছিল উট। উট তাদের নিকট The ship of the desert বা 'মরুভূমির জাহাজ' নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি তাঁর *History of the Arabs* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন- The camel is the nomads' nourisher, his vehicle of transportation and his medium of exchange. The dowry of the bride, the price of the blood, the profit of maysir (gambling). The wealth of a Sheikh, are all computed in terms of camels.

আরব জাতি

আরব ভূমির প্রাচীন জাতিসত্তা সম্পর্কে কোনো সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে একথা ঠিক, বিভিন্ন সময়ে আরব দেশে বিভিন্ন জাতির লোক বসবাস করতো। আরব উপদ্বীপের আদিম অধিবাসীদের সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করা এখনো সম্ভব হয়নি। স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্দীপ্ত আরব জাতি প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- **১.** অধনা লুপ্ত আরবে বায়িদা, ২. প্রকৃত আরব বা আরবে আরিবা ও ৩. আরবে মুস্তারিবা।

আরবে বায়িদা : আরবের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসীদের আরবে বায়িদা বল হয়। বায়িদা বা বাদিয়া অর্থ জঙ্গল। বায়িদাবাসীদের বেদুইন বলা হয়। তারা আরবের এত প্রাচীন বাসিন্দা, যাদের কোনো নিদর্শন এবং অবস্থার কোনো বিবরণ ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শুধু কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফ এবং আরবদের কিছু কবিতা ও পুরনো ধ্বংসাবশেষ থেকে তাদের অস্তিত্বের যৎসামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন- আদ (Aad), সামুদ (Samud), তাসম (Tasm), জাদিস (Jadis), আমালেকা (Amleka), প্রভৃতি প্রাচীন আরব গোত্রগুলো। বিভিন্ন সময় এ গোত্রগুলোর উত্থান ঘটেছিল, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন ও বিভিন্ন ধরনের পাপাচারের কারণে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন আরবের এ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহকে বলা হয় আরবে বায়িদা।

আরবে আরিবা (প্রকৃত আরব বা বনু কাহতান) : আরবে আরিবা (Arabian Arabs) অর্থ- প্রকৃত আরব। আরবে বায়িদা জাতির বিলুপ্তির পর যারা প্রথম আরব দেশে আবাসস্থল গড়ে তোলে তাদের আরিবা বল হয়। তারা নিজেদের ইয়ারুব ইবনে কাহতান বা কাহতানের বংশধর বলে মনে করতো। তারা ইয়েমেন বা দক্ষিণ আরবে বাস করতো বলে তাদের ইয়েমেনিও বলা হতো।

আরবে মুস্তারিবা : হযরত ইবরাহীম এর সময় থেকে বিবি হাজিরা (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) মক্কায় বসবাস আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে যমযম কূপের সৃষ্টি এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর নিরলস প্রচেষ্টায় পবিত্র কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে নতুন নতুন বসতি স্থাপিত হতে থাকে। অন্যদিকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তান-সন্ততিদেরও বংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরাই আরবে মুস্তারিবা নামে অভিহিত। আদনান নামক হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর এক বংশধর মুস্তারিবা

গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। হিজায, নজ্‌দ্‌, পেত্রা ও পালমিরা অঞ্চলে বসবাসকারী মুস্তারিবা গোত্রের নিযারি (Nizari) শাখা থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর কুরাইশ বংশের উদ্ভব হয়।

অধিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ

ভূপকৃতির ভারতম্য অনুসারে আরবের অধিবাসীদের দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা- শহরের স্থায়ী বাসিন্দা ও মরুবাসী যাযাবর।

ক.শহরবাসী (Townsmen) : আরবের উর্বর তৃণ অঞ্চলগুলো স্থায়ীভাবে বসবাসের উপযোগী ছিল বিধায় সেখানে অসংখ্য শহর জনপদ গড়ে ওঠে। স্থায়ী বাসিন্দাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের ফলে এরা মরুবাসী বেদুইনদের তুলনায় অধিকতর রুচিশীল ও মার্জিত স্বভাবের ছিল। মরুবাসী আরবদেও অনেকেই যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করে। অন্যদিকে দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে শহরের কিছুসংখ্যক স্থায়ী বাসিন্দাও বাধ্য হয়ে যাযাবরবৃত্তি গ্রহণ করে।

খ.মরুবাসী (Nomad) : আরবের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ ও মরুবাসী বেদুইন। বেদুইনগণ জীবনধারণের জন্য মরুভূমির সর্বত্র ঘুরে বেড়াত এবং তৃণের সন্ধানে এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে গমণ করতো। তাদের গৃহ ছিল তাঁবু, আহার্য ছিল উটের মাংস, পানীয় উট ও ছাগলের দুধ, প্রধান জীবিকা লুটতরাজ। কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত যাযাবররা অন্যদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে বাধ্য হতো। কখনো আবার তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিত্তশালীদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করতো। হিট্টি বলেন, যাযাবরবৃত্তি একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা।

প্রাচীন আরবের ভৌগোলিক গুরুত্ব

কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আরব উপদ্বীপ যুগ যুগ ধরে বিশ্বের নাভিকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আরবের পশ্চিমে লৌহিত সাগর ও সুয়েজ যোজক। পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর। দক্ষিণে ভারত মগাসাগর। উত্তরের সীমারেখা আলেপ্পো রাজ্য ও ফোরাত নদী। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে আরব উপদ্বীপ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের মিলন স্থলে অবস্থিত। এশিয়ার মূল ভূখণ্ড ও আফ্রিকা মহাদেশের মাঝখানে অবস্থিত এ অঞ্চল ইউরোপ মহাদেশ থেকেও বেশি দূরে নয়। তাই এ উপদ্বীপকে যথাযথভাবেই তিন মহাদেশের মিলনকেন্দ্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অতীতকাল থেকেই ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে এ অঞ্চল বহুজাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের চলাচল পথ বা ক্যারাভান রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

উত্তর আরবের সামান্য কিছু স্থানে মরূদ্যান রয়েছে, সেখানে লোকবসতি গড়ে উঠেছে। এছাড়া প্রায় সমগ্র আরব অঞ্চল মরুময়। হিজায, নজদ এবং আল আহসা প্রদেশ নিয়ে আরব দেশ গঠিত। বর্তমানে সৌদি রাজবংশ কর্তৃক আরবের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। হাদরামাউত, ইয়েমেন এবং ওমান নিয়ে দক্ষিণ আরব গঠিত। আরব ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ মরুময়। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মিলনকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হলেও এদেশ যেন সমগ্র বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন। উত্তর-ভাগে 'নুফুদ' মরুভূমি এবং নুফুদ হতে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে আরবের বৃহত্তম মরুভূমি 'আল-দাহনা' [আদ-রার, আল-খালি]।

আরবের প্রদেশসমূহ : ভৌগোলিক পরিবেশ বিবেচনায় আরবদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. হিজায, ২. নজদ, ৩. ইয়ামেন, ৪. তিহামা, ৫. আরূজ।

হিজায : লৌহিত সাগারের পূর্বকূল ঘেঁষে সিরিয়া সীমান্ত হতে ইয়ামেন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে হিজায বলে। এ হিজাযই ইসলামের কেন্দ্রস্থল। এতে মক্কা, মদিনা তায়েফ, জেদ্দা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শহরগুলো অবস্থিত। মক্কা, মদিনা ও তায়েফের সাথে রাসূল (সা.) এর গভীর সম্পর্ক ছিল। এই হেজাজের পবিত্র ভূমির বরকতে আরবগণ বিশ্বের ইতিহাসে অতূলনীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। জিদ্দা বিখ্যাত নদীবন্দর, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পানি পথে আগত সম্মানিত হাজীগণ অবতরণ করেন। হিজায শব্দের অর্থ হলো- পৃথক ও বিরত করা। যেহেতু হিজায অঞ্চলটি নজদ ও তিহামাকে মধ্যে পৃথক করেছে এজন্য এটি হিজায নামে অভিহিত হয়েছে। হিজাযের পশ্চিমাংশে লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে ফসলাদি উৎপন্ন হয়।

তিহামা : তেহামা আরবি শব্দটি 'তাহমুন' হতে নির্গত। অর্থ হলো প্রচণ্ড গরম বা তাপ। এ প্রদেশে অধিক গরম পড়তো বলে একে তিহামা নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ প্রদেশটি লোহিত সাগরের তীর হতে সারাত পর্যন্ত বিস্তৃত।

আরূজ : আরূজ প্রদেশটি নজদের দক্ষিণ হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইয়ামামা, বাহরাইন, উম্মান ও হাদরামাউত ইত্যাদি এ প্রদেশে অন্তর্ভূক্ত।

ইয়ামেন : হিজায থেকে আদন (Aden) পর্যন্ত লোহিত সাগরের কিনারা বেয়ে বিস্তৃত অঞ্চলকে ইয়ামেন বলে। এর উত্তরে হাদরামাউত, পূর্বে উম্মান এবং বাহরাইন, পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত। এটি আরবের সর্বাধিক উর্বর ও চাষাবাদযোগ্য প্রদেশ। অতীতে এটি উন্নত ও উর্বর অঞ্চল হিসাবে বিখ্যাত ছিল। 'ইয়ামেন' আরবি শব্দ 'ইয়ামেন' (দক্ষিণ) হতে নির্গত। এটি আরব ভূখণ্ড এবং কা'বা ঘরের দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ার কারণে এ নামকরণ করা হয়।

নজদ : মধ্য আরবে ইয়ামেন হতে ইরা পর্যন্ত যে পাহাড়টি চলে গেছে তার পূর্ব অংশকে নজদ বলে। নজদের রাজধানী রিয়াদ। এটা হিজাযের পূর্বে এবং সিরিয়া মরুভূমির দক্ষিণে অবস্থিত। উঁচু ভূমিকে নজদ বলা হয়। এ অঞ্চলটি পার্শ্ববর্তী হিজায হতে উঁচু বলে একে নজদ বলে। এই প্রদেশের উত্তরাঞ্চলেই সংগঠিত হয়েছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'দাহিস' ও 'বাসুস্' যুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধই প্রায় চল্লিশ বছর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মানচিত্রে প্রাচীন আরবের বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করুন।**

আরবের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত অবস্থান কত?	আরবের কয়েকটি প্রাচীন অধিবাসীর নাম উল্লেখ করুন।	প্রাচীন আরবরা কয়ভাগে বিভক্ত?	'জাজিরাতুল আরব' অর্থ কী?

সারসংক্ষেপ :

অনুর্বর মরুভূমি ও সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে এ দেশটি কখনো আক্রমণকারীদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়নি। তবে সর্বশেষ রাসুলের আগমনের প্রতীক্ষায় অনেকের ন্যায় ইহুদী-খ্রীস্টানরাও আরব ভূমিতে অপেক্ষার প্রহর গুনছিল। প্রাচ্য, প্রাশ্চাত্য ও উত্তর দিক থেকে আগত সকল বাণিজ্যিক পথগুলো আরব ভূ-খণ্ডের সাথে মিলিত হয়েছিল। ফলে আরব ভূখণ্ড বিশেষত মক্কা, জিদ্দা, তায়িফ, মদীনা, ইয়ামবু ও দুমাতুল জান্দালের সাথে ভারত, চীন, ইরাক, মিসর, রোম ও ইথিওপিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরবকে বিশ্ব সভ্যতার মিলনস্থলে পরিণত করে। ভৌগলিক পরিবেশ ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠির একটি চিত্র সামনে থাকলে আরব ভূমিতে রাসূলের আগমনের পরিপার্শ্বিক বিষয়াবলী সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভ করা সহজ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

১। 'উম্মুল কুর'া বলা হয় কোন্ স্থানকে?
(ক) আরব (খ) মক্কা (গ) মদিনা (ঘ) বসরা

২। মুস্তারিবা গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
(ক) কাব (খ) মুররা (গ) মা'আদ (ঘ) আদনান

৩। আরবে খেজুর গাছকে Queen of the trees বলে অভিহিত করার কারণ-
i. এ গাছ ধনী-দরিদ্র সকলের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিল;
ii. খেজুর ব্যতীত আরবদের জীবন কল্পনাই করা যেত না; iii. খেজুর আরবদের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য;
নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i. (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বেদে সম্প্রদায়কে প্রায়ই দেখা যায়। তারা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নৌকায় ঘুরে বেড়ায়। নৌকা-ই হচ্ছে তাদের ঘর বাড়ী, সংসার সবকিছু। সাপ ধরা, সাপের খেলা দেখানো, বিভিন্ন ঔষধি গাছের শিকড় বিক্রি ইত্যাদি হচ্ছে তাদের পেশা। তারা নিদ্দিষ্ট স্থানে বেশিদিন স্থায়ী হয় না। যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবন।

(ক) জাজিরাতুল আরব অর্থ কী? ১
(খ) মরুভূমির জাহাজ বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের বেদে সম্প্রদায়ের সাথে প্রাক ইসলামী আরবের কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য খুজে পাও ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) আরবের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার উপর ভৌগলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-২.২ আইয়ামে জাহিলিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইয়ামে জাহিলিয়ার পরিচয় ও সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- আইয়ামে জাহিলিয়া যুগের সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	**আইয়ামে জাহিলিয়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, মাৎসান্যায় যুগ, ঈসা (আঃ), ইয়াযদান ও আহেরমান ও তাওরাত**

আইয়ামে জাহিলিয়া

ইসলামের আবির্ভাব তথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এ সময় আরবসহ সমগ্র বিশ্ব ছিল মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে তমাসাচ্ছন্ন। এ যুগে আইন-কানুন, নীতি নৈতিকতা, শিক্ষাসংস্কৃতি, জ্ঞানবুদ্ধিবৃত্তি, মানবতাবোধ, ধার্মিকতা, শুদ্ধতা এবং আর্থাসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো সুষ্ঠুতা ছিল না; বরং সর্বক্ষেত্রেই সর্বগ্রাসী বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। ইসলামের আবির্ভাবে এ অমানিশার অবসান ঘটে এবং সত্যিকার সুন্দর প্রভাতের আলোকচ্ছটায় আরবসহ সমগ্র বিশ্ব সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আইয়ামে জাহিলিয়ার পরিচয়

আইয়ামে জাহিলিয়া দুটি আরবী শব্দের সমষ্টি হলো- ১. আইয়াম ও ২. জাহিলিয়া। আইয়াম শব্দটি আরবি ইয়াওমুন শব্দের বহুবন। অর্থ হলো- দিন, যা লাইলুন বা রাতের বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়। তবে ইয়াওমুন শব্দের ব্যবহার সময়, কাল, যুগ, time, period, age ইত্যাদি অর্থেও হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন- আমি মানুষের পরস্পর উন্নতি ও অবনতির যুগ পরিবর্তন করে থাকি। এখানে আইয়াম দিয়ে যুগ বুঝানো হয়েছে।

আর জাহিলিয়া শব্দটি আরবি জাহলুন শব্দ থেকে উৎলিত। অর্থ হলো- বর্বরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, তমসা বা অন্ধকার, Ignorace, darkness. তাই আইয়ামে জাহিলিয়া অর্থ তমসা বা অন্ধকার যুগ। ইংরেজিতে বলা হয় The age of Ignorance. ইসলামের ইতিহাসে এ শব্দটি নবী করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেকার আরবদের অবস্থা সম্পর্কে ব্যবহার হয়। কেননা এ যুগে আরবরা সাধারণত স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যদিও কোনো ঐতিহাসিক 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বলতে হযরত ঈসা (আ.) এবং নবী করীম (সা.)-এর মধ্যকার 'ফাতরাতে অহী' তথা অহী মুলতবির সময়কে উদ্দেশ্য করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পরবর্তী কালের কোনো উল্লেখ নেই। কেননা হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পর থেকেই ক্রমান্বয়ে সমগ্র আরবে মূর্খতাজনিত অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতার অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করতে থাকে, যা পরবর্তীকালে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

আইয়ামে জাহিলিয়ার সময় ও ব্যাপ্তি

আইয়ামে জাহিলিয়ার সময়সীমা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানাবিধ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বহুলালোচিত সেসব মতভেদ হচ্ছে-

ক. অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়া বলা হয়, কিন্তু এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এর অন্তর্বর্তীকালে মানুষকে হেদায়াত করার জন্য পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূলের আগমন ঘটেছিল। তাছাড়া পবিত্র কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নবীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, "হযরত ঈসা "(আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যবর্তী সময়কালই আইয়ামে জাহিলিয়া।"

গ. ঐতিহাসিক ড. নিকোলসন ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে জাহিলিয়া বলে অভিহিত করেছেন। পি.কে.হিট্টি এ মত সমর্থন করেছেন।

ঘ. প্রফেসর পি.কে.হিট্টি তাঁর প্রণীত 'হিস্ট্রি অব দা আরবস' গ্রন্থে আইয়ামে জাহিলিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- The term Jahiliyah, usually rendered time of ignorance or barbarism in reality means the period in which Arabia had no dispensation, no inspired prophet, no revealed book.

ঙ. ঐতিহাসিক মুইর বলেন, "হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যবর্তী সময়কেই আইয়ামে জাহিলিয়া বলে।"

চ. ড. এস এম ইমামুদ্দিনের মতে, "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের পূর্বে ৬১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে জাহিলিয়া বলে বোঝানো হয়েছে।"

ছ. কুরআন মাজীদে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববতী সময়কে জাহিলিয়া যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী-হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা জাহিলী যুগের ন্যায় ইসলামের আগমনের পরও বাইরে অবাধে বের হয়ো না।

জ. পবিত্র হাদীসে নববীর ভাষ্যমতে, মহানবী (সা.)-এর অহীপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়কেই আইয়ামে জাহিলিয়া হিসেবে বোঝানো হয়েছে। নবী করীম (সা.) এক হাদীসে হযরত আবু যর (রা)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন- হে আবু যর! তুমি এমন ব্যক্তি যার মধ্যে জাহিলিয়া রয়ে গেছে।

অতএব আইয়ামে জাহিলিয়া বলতে আরবের অন্ধকার যুগকে বোঝানো হয়েছে, যা ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। উপরিউক্ত আলোচনায় আইয়ামে জাহিলিয়ার যে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ইতিহাস বিশ্লেষকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তারা বলেন, যে সময়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়, সে সময় দক্ষিণ আরব জ্ঞানগরিমায় উন্নত এবং আরববাসী সাহিত্য সংস্কৃতি, ঐতিহ্য চেতনাসহ নানা সৎ গুণাবলিতে ভূষিত ছিল। তাই জাহিলী যুগের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে যুগে কোনো নবী রাসূল, ঐশী কিতাব না থাকায় আরববাসী নানা প্রকার অন্যায়-অনাচার, সামাজিক বিশৃংখলা, কুসংস্কার, ব্যভিচার ও মানবতাবোধের অধঃপতন, সর্বোপরি ধর্মীয় অবক্ষয়ের চরম সীমায় উপনীত হয়। জাহিলিয়া যুগে সমগ্র পৃথিবীই অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র মানব সমাজ ছিল পথভ্রষ্ট। কোনো জাতিই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল না। তারা নবী-রাসূলদের প্রদর্শিত পথ ও শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টিরই তারা উপাসনা করতো।

প্রায় সকল সমাজেই দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল। দাস-দাসীকে পণ্য দ্রব্যের ন্যায় হাট বাজারে বেচা-কেনা করা হতো। তাদের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। শাসকরা প্রজাদের মৌলিক অধিকার হরণ করতো। শাসক কর্তৃক প্রজাদের ওপর নির্যাতন চালানো হতো। উত্তর-দিকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত তাতারীদের দাপট ছিল। তারা ভারত, ইরান ও ইউরোপে লুটতরাজ করতো। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘাত লেগে থাকত। কোনো দেশেই শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল না।

আইয়ামে জাহিলিয়া ও বর্তমান সমাজ

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাহিলী যুগের সমাজ দর্শন, রাজনৈতিক চিন্তন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো সর্বোতভাবেই মানব জাতির স্বাভাবিক চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিপরীত পথে চলছিল। শুধু আরব নয়; সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাই মানবাধিকারের ব্যাপক অবমূল্যায়ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এমতবস্থায় শান্তির বার্তা নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব ছিল অনিবার্য। কিন্তু দুখের বিষয় হচ্ছে, জাহিলী সমাজের বিচিত্র ঘৃণিত প্রথা ও কর্মসমূহ আধুনিক সমাজে আবারো দেখা দিচ্ছে। জীবিত কন্যা সন্তানের হত্যার ধরণ পাল্টেছে মাত্র। আল্ট্রা সনোগ্রাফির মাধ্যমে কন্যা সন্তানের ভ্রূণ নিশ্চিত হয়ে প্রতিনিয়ত কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জাহিলী সমাজের চেয়েও ঘৃন্য কায়দায় প্রকাশ্যে দিবালোকে হত্যা করা হচ্ছে। খুন, জখম, গুম যেন নতুন বর্বর সংস্কৃতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। দারুন নদওয়া যেখানে আরব সমাজের সর্বদলীয় সংসদ ছিল, সেরকম কোন ধারণা এ সভ্য সমাজে খুজে পাওয়া যাবে কী? নারীকে পণ্যের মডেল বানিয়ে ভোগের বস্তুতে পরিণত করার এক জাহিলী উম্মাদনায় বিশ্ব আজ সয়লাব।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইয়ামে জাহিলিয়া সম্পর্কে ধারণা দিন।

সারসংক্ষেপ :

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত আরব দেশ সেমেটিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। আরবের মক্কা নগরীতে অবস্থিত কাবা ঘরের বদৌলতে আরব-বিশ্ব মানবতার মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। জীবন্ত কন্যা সন্তানের হত্যা, খুন, যুদ্ধ-সংঘাত প্রভৃতি নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমকালীন রোমান-পারস্য সাম্রাজ্য শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়। এ অঞ্চলে চরম অরাজকতা চলতে থাকে। ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ব্যক্তিতন্ত্র মানুষের টুটি চেপে ধরেছিল। মোট কথা মহানবী (সা:) এর জন্মের পূর্বে আরব তথা সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় এক অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আইয়ামে জাহিলিয়া শব্দে অর্থ কী?
   ক) অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ খ) প্রগতির যুগ
   ঘ) গোঁড়ামির যুগ ঘ) কালোছায়ার যুগ

২. আল কুরআনে কতজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
   ক) ২৫ জন খ) ৩০ জন
   ঘ) ২৬ জন ঘ) ২৭ জন

৩. 'মাৎস্যন্যায় যুগ' কোন অঞ্চলে বিরাজমান ছিল?
   ক) ভারত খ) বাংলা
   গ) চীন ঘ) পাকিস্তান

৪. আধুনিক যুগে কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যের চিত্র কিরূপ?
   ক) ভ্রুণ হত্যা খ) কন্যার জন্মে মন খারাপ
   গ) ছেলে সন্তানের আকাংঙ্খা ঘ) সবগুলো।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

দীর্ঘদিন ধরে বাক্কা শহরসহ সমগ্র বিশ্বে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান ছিল। সামাজিক নিয়ম নীতি বলতে কিছু ছিল না। সমসাময়িক সকল সুযোগ সুবিধা থাকার পরেও প্রকৃত বিদ্বান ও সৎ লোকের অভাবে সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছিল। নানা দল ও মতে বিভক্ত মানব সন্তানেরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত ছিল। একসময় বাক্কাতে একজন মহৎ লোকের আবির্ভাব ঘটে। বাক্কা শহরসহ গোটা বিশ্বের অবস্থার উন্নতি ঘটে।

(ক) আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ কী? ১
খ) জাহেলিয়া যুগের সময়কাল উল্লেখ করুন। ২
গ) উদ্দীপকের অবস্থার সঙ্গে জাহেলী যুগের সময়ের তুলনা দিন। ৩
ঘ) 'সমগ্র আরবই জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত ছিল।' আপনি এর স্বপক্ষে যুক্তি লিখুন। ৪

পাঠ-২.৩ জাহিলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আরবের গোত্রীয় শায়খতন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জাহিলী যুগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে জানতে পারবেন এবং
- জাহিলী যুগের দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**হস্তি বাহিনী, গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা, জঙ্গে বুয়াস, তাগলিবের যুদ্ধ ও দারুন নদওয়া**

প্রাক ইসলাম যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় ভরপুর। না ছিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, না ছিল কোনো সংবিধান। মনগড়া মতবাদের ছায়ায় আদিম যুগের বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা হচ্ছিল। ঐতিহাসিক হার্বাট মুলারের ভাষায়- In Mohammad's Arabia there was no state- there were only scatered independent tribes and towns.

সাম্রাজ্যবাদের শিকার : কোনো কেন্দ্রীয় শাসকের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় তৎকালীন আরব সাম্রাজ্যবাদী দু'পরাশক্তি রোমান ও পারস্যের লোলুপ দৃষ্টির শিকার ছিল। উত্তর আরব রোমানদের এবং দক্ষিণ আরব পারসিকদের কর্তৃত্ব বলয়ে ছিল। আবিসিনীয় আগ্রাসনভীতিও আরবকে সর্বদা শঙ্কিত রাখত। ইয়েমেন জবরদখলকারী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান শাসক আবরাহার ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবাঘর আক্রমণ করতে আসার ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে উত্তর ও দক্ষিণ আরব ব্যতীত সমগ্র আরবদেশই স্বাধীন ভূমি হিসেবে পরিচিত ছিল।

গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা : মহানবী (সা.)-এর যুগে আরবের রাজনৈতিক অঙ্গনে কেন্দ্রীয় সরকারের অভাবে গোত্রতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। আরবরা ছিল বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। আরবিতে গোত্রকে 'কাবিলা' বলা হয়। প্রতিটি গোত্র বংশ হিসেবে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। গোত্রের বিভক্ত অংশগুলোকে একত্রে কাওম বলা হতো। কখনো কখনো কতিপয় গোত্র মিলে সহাবস্থানের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করতো। এসব চুক্তিকে 'আল আহনাফ' বা মৈত্রী চুক্তি বলা হতো। আরবদের সমাজ জীবনে গোত্রই ছিল একমাত্র নিরাপত্তার চাবিকাঠি। এজন্য গোত্রভুক্ত হয়ে বসবাস করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। স্বগোত্রীয় সদস্যদের প্রতি তারা যেমন সহানুভূতিশীল ও বন্ধুভাবপন্ন ছিল, তেমনি শত্রু গোত্রের প্রতি তারা চরম শত্রুতা পোষণ করতো।

নেতা নির্বাচন পদ্ধতি : আরবের গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় নেতা ছিলেন গোত্রীয় প্রধান। প্রত্যেক গোত্রে শায়খ নামে একজন দলপতি ছিলেন। বয়স, বিচার বুদ্ধি, সাহস, আর্থিক অবস্থা, অভিজ্ঞতা যাচাই বাছাই করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখ নির্বাচিত হতেন, আবার নির্বাচনের মাধ্যমেই শায়খ পরিবর্তন করা হতো। এজন্য তার মেয়াদকাল সম্পূর্ণরূপে নির্বাচকমণ্ডলীর সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল ছিল। আরবদের শেখের প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। শায়খ-এর যে কোনো নির্দেশ পালনে তারা জীবনপণ প্রচেষ্টা চালাতো।

গোত্রীয় কলহ ও যুদ্ধ : প্রাকইসলাম যুগে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে গোত্রীয় কলহের সূত্রপাত হতো। এ কলহের ধারাবাহিকতা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে বংশানুক্রমে চলতো। যেমন বনু বকরের সাথে বনু তাগলিবের যুদ্ধ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে জঙ্গে বুয়াস এবং কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রের মধ্যে হারবে ফিজার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। লাগাতার যুদ্ধবিগ্রহের এ সময়কে আরবদের ইতিহাসে 'আইয়ামে হারব' বলা হয়েছে। সামান্য কারণে, যেমন পানির নহর ব্যবহার, জীবজন্তুর তৃণলতা ভক্ষণ, গবাদি পশু পালন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে এক গোত্র অপর গোত্রের সাথে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো।

রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতার অভাব : প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য বলতে কিছুই ছিল না। রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন- Their political life was

in a thoroughly primitive level. এজন্যই তাদের রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ মোটেই ছিল না। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, স্থিতিশীলতার অভাবে তখন তাদের প্রশাসন পদ্ধতি খুব সহজে পরিবর্তন হয়ে যেত। সারা বছর ধরেই সবাইকে মানসিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে থাকতে হতো।

মন্ত্রণা পরিষদ : তৎকালীন মক্কায় 'আল-মালা' নামে একটি মন্ত্রণা পরিষদ গড়ে ওঠে। এ পরিষদ মক্কা এবং শহরতলীর শাসনব্যবস্থা তদারক করতো। বেদুইনদের মতো মৈত্রী জোট গঠন, বৈদেশিক বাণিজ্যক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনেও মন্ত্রণা পরিষদ সক্রিয় ভূমিকা রাখতো।

সংবিধানের অভাব : সংবিধান যে কোনো রাষ্ট্র বা সংস্থা সংগঠনের চালিকাশক্তি। নিয়মতান্ত্রিক কোনো দেশ বা সংগঠন গঠনতন্ত্র বা সংবিধান ছাড়া চলতে পারে না। জাহিলী যুগের আরবদের দেশ পরিচালনার উপযোগী কোনো সংবিধান ছিল না বলে তারা সুষ্ঠু কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারত না।

'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি : জাহিলী যুগের আরবদের মূলনীতি ছিল জোর যার মুল্লুক তার। সন্ত্রাসবাদ, সহিষ্ণুতা, গোত্রীয় যুদ্ধ ইত্যাদি পন্থায় আরবরা একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতো।

জঙ্গে বাসুস : প্রাকইসলাম যুগের আরবে সংঘটিত প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহের মধ্যে বাসুসের যুদ্ধ অন্যতম। আরবের বনু বকর ও বনু তাগলিবের মধ্যে সংঘটিত এ যুদ্ধ ৪৯৪ থেকে ৫৩৪ সাল পর্যন্ত মোট ৪০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ যুদ্ধে প্রায় ৭০ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। উভয় গোত্রই পরস্পর আত্মীয় ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল। উভয়ই নিজেদের ওয়ায়েরের বংশধর বলে দাবি করতো। একটি উষ্ট্রী জখম হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাসুস যুদ্ধের সূচনা হয়। উষ্ট্রীটির নাম ছিল বাসুস। এটির মালিক ছিলেন বনু বকর গোত্রের হাসসাম নামক এক ব্যক্তি। উষ্ট্রীটি বনু তাগলিবের কোনো এক ব্যক্তি হাতে আহত হয়েছিল।

জঙ্গে দাহিস : ইসলামপূর্ব যুগের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধজনিত সংঘাতসমূহের মধ্যে জঙ্গে দাহিস অন্যতম প্রসিদ্ধ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ গাত্ফান গোত্রের দুটি শাখা বনু আবস ও বনু যুবিয়ানের মধ্যে ৫৬৮ থেকে ৬৩১ সাল পর্যন্ত মোট ৬৩ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ যুদ্ধে অনেক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ নেই। এ যুদ্ধে আরব বীর আন্তারা বিন শাদ্দাদ তাঁর বীরত্ব ও কবিত্বের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

গোত্রীয় জোট : পবিত্র নগরী মক্কায় অবস্থিত কাবা শরীফের কারণে মক্কা নগরী ও নগরবাসী কুরাইশদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ কারণে কুরাইশ গোত্রের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এবং পার্শ্ববর্তী আরো কতিপয় গোত্রের মধ্যে একটি মৈত্রীজোট বা গোত্র-সংঘ রূপ লাভ করে। এ জোটের নেতাদের পরামর্শ অনুযায়ী একটি আন্তঃগোত্রীয় শাসনব্যবস্থাও গড়ে ওঠে।

মক্কার নগর রাষ্ট্রের মর্যাদা : আরবে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কিংবা সংগঠিত কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন না থাকলেও ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে মক্কায় অগ্রসর রাজনীতি ও নগর রাষ্ট্রের উন্মেষ হয়েছিল। মক্কা নগর রাষ্ট্র পরিচালনার মূলে ছিল কুরাইশ গোত্রপতিদের সমন্বয়ে গঠিত 'মালা' বা মন্ত্রণাপরিষদ। এ পরিষদ মক্কা নগর রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা তদারক করতো। এছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বেদুইনদের সাথে মৈত্রীজোট গঠন করাও এ পরিষদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মক্কার প্রশাসনিক ব্যবস্থা : কুরাইশদের একজন পূর্বপুরুষ 'কুসাই' ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর প্রাক্কালে স্বীয় পুত্র আবদুদ দারকে অলী নির্বাচন করেন। তিনি তৎকালীন মক্কার শাসনব্যবস্থা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা-

১. হিজাবা : কাবা ঘর আবৃতকরণ।
২. সিকায়া: যম্যম্ কূপ থেকে হাজীদের পানি বিতরণ।
৩. রিফাদা: হজ্জ পালনকারী লোকদের পবিত্র নগরীতে সাদর সম্ভাষণ জানানো।
৪. নাদওয়া: কার্যকরী কমিটির সদস্যপদ।
৫. লিওয়া: পতাকা উত্তোলন করা।

দারুন নাদওয়া : কুসাই কাবাঘর সংস্কার ও মন্ত্রণাপরিষদ বিভক্তকরণের পাশাপাশি কাবাঘরের পাশে আরেকটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, যার নামকরণ করা হয় দারুন নদওয়া বা মন্ত্রণাপরিষদ। দারুন্ নাদ্ওয়ায় বসে নগরের অভিজাতবর্গ যে

কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, কিন্তু নগর ও কাবাঘর বিষয়ক কার্যক্রম, যেগুলোর সাথে সর্বসাধারণের সংশ্লিষ্টতা ছিল, সেগুলোর জন্য সকল নাগরিক কাবা প্রাঙ্গনে সাধারণ সভা করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	আরবের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

'আল-মালা' কী ?	শায়খ নির্বাচনের তিনটি গুণ উল্লেখ করুন।	মক্কার পাঁচটি প্রশাসনিক ইউনিটের নাম লিখুন?	'দারুন্ নাদ্ওয়া' কোথায় অবস্থিত?

সারসংক্ষেপ :

আরব সমাজের মূলভিত্তি ছিল গোত্রপ্রথা। একই গোত্রের মধ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে কেউ অপরাধীকে সাহায্য করতো না, কিন্তু অপর কোনো গোত্র যদি কারো নিজ গোত্রের কাউকে হত্যা করতো, তাহলে সমগ্র গোত্রের সক্ষম ব্যক্তিরা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহনের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ত। এক্ষেত্রে রক্তের পরিবর্তে রক্তের দাবি জানানো হতো। যাযাবর আরব গোত্রপ্রধানদের শায়খ বলে অভিহিত করা হতো। গোত্রকেন্দ্রিক মরুবাসী বেদুইনদের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য 'আসাবিয়াহ' বা গোত্র প্রীতি। গোত্রপ্রীতি ও রক্ত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই এ কওম চেতনা পরবর্তীকালে আরব জাতি গঠন এবং ইসলামের বিস্তৃতিতে সহায়ক হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দারুন নদওয়া নির্মাণ করেন কে?
   ক. কুসাই খ. কিলাব
   গ. আবদুল মুত্তালিব গ. কুরাইশ

২. জঙ্গে দাহাস কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?
   ক. ১৩ খ. ১৪
   গ. ৬৩ গ. ৬৪

৩. বাসুস যুদ্ধের নামকরণ হয়-
   ক. স্থানের নামে খ. ব্যাক্তির নামে
   গ. জন্তুর নামে গ. পাহাড়ের নামে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

রাজশাহী অঞ্চলের বরেন্দ্র ভূমিতে সাঁওতাল উপজাতি বাস করে। তারা দলবদ্ধভাবে মাঠে কাজ করে। কেউ কোনো বিপদে পড়লে সকলেই স্বতস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তারা কখনও একাকী কোথাও বিচরণ করে না। সর্বদা দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে। দলীয় প্রধানের আদেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের আদেশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

(ক) কোন যুদ্ধ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল? ১
(খ) আল মালা বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দলবদ্ধ হয়ে বসবাসের ধারণা গোত্র প্রথার সাথে কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা দিন। ৩
(ঘ) জাহেলী যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি ছিল 'জোর যার মুলক তার'- বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-২.৪ জাহিলিয়া যুগে আরবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাহিলী সমাজের সামাজিক অবস্থাবলী এবং
- জাহিলী সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**দাসত্বপ্রথা, নারীর জীবন্ত কবরস্থকরণ, দাসত্বপ্রথা, সুদপ্রথা, ব্যাভিচার ও কুসংস্কার**

জাহিলিয়া যুগে আরবের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তারা মানবেতর জীবনযাপন করতো। তারা আইন কানুনের কোনো প্রয়োজন মনে করতো না। তারা বিশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতো। আরবরা ছিল স্বাধীনচেতা। তাই তারা শাসনের কোনো পরোয়া করতো না। তারা অসংখ্য গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্রে গোত্রে শত্রুতা ছিল তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তুচ্ছ কারণে গোত্রে গোত্রে কলহ বেঁধে যেত এবং তা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকতো। খুনের বদলা নেয়ার জন্য তারা যুদ্ধ করতো। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় আরবে বংশভিত্তিক ও গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খাঁ বলেন, "প্রাক-ইসলাম যুগে সেখানে যে বংশগত ও গোত্রগত কৌলীন্য প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"

সামাজিক অবস্থা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বিভিন্ন পাপাচার, ব্যাভিচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অনাচার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান ও নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডে সমাজ কলুষিত হয়ে পড়েছিল। গোত্রভিত্তিক আরব সমাজের দুটো পৃথক শ্রেণি মরুবাসী বেদুইন এবং শহরবাসী আরবদের জীবনযাত্রা প্রণালি ছিল একই সূত্রে গাঁথা। উভয় শ্রেণির বৈবাহিক সম্পর্ক ও আচার অনুষ্ঠান, ধ্যানধারণা ও রীতিনীতি ছিল প্রায় একই রকম।

মদ ও জুয়া : ঐতিহাসিক খোদা বখ্‌শ-এর মতে, War, Women and Wine were three absorbing passions of the Arabs. অর্থাৎ, মদ, জুয়া ও নারী- এ তিনটি ছিল আরবদের মুখ্য নিত্যব্যবহার্য বস্তু। মদ এবং নর্তকী ছাড়া তাদের জীবন কল্পনাও করা যেত না। তারা মদ্যপানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। মাদকাসক্ত আরবরা যে কোনো গর্হিত কাজ করতে দ্বিধা করতো না। তৎকালীন আরব দেশে মদ্যপান ও জুয়া খেলা কত লোককে যে সর্বস্বান্ত করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

নারীর অবস্থান : ঐতিহাসিকদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সে যুগে আরব, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যসহ সমগ্র বিশ্বে সমভাবে নারীর অবস্থা ছিল সীমাহীন অবমাননাকর ও হৃদয়বিদারক। তারা ভোগের সামগ্রী ও অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হতো। সমাজে তাদের কোনো রকম মান-মর্যাদা বা অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ যত খুশি বিয়ে করতো এবং যত খুশি তালাক দিতে পারত। তৎকালীন আরবে চার ধরণের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

প্রথমতঃ এক নারী-পুরুষের বিয়ে,

দ্বিতীয়তঃ এক ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতো ও

তৃতীয়তঃ একজন স্ত্রীলোক একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতো।

চতুর্থতঃ পন্থাটি ছিল বর্তমান সময়ের পতিতালয়ের মতো। একজন রমণী তার গৃহের সামনে একটি নির্দিষ্ট পতাকা স্থাপন করে রাখত। এর মাধ্যমে লোকজন গৃহটি শনাক্ত করতে সক্ষম হতো। মোটকথা, মানবতা-বিবর্জিত জাহিলী যুগে নারীর কোনো মূল্যই ছিল না। নারীকে আপদ অশুভ বলে মনে করা হতো।

কন্যা সন্তানদের অবস্থা: জাহিলী যুগে কোনো ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানের জন্মে খুশি হতো না। কন্যার জন্ম সংবাদ দেয়া হলে তাদের চেহারা লজ্জায় কালো হয়ে যেত। এটা তাদের নিকট ছিল এক চরম লজ্জার ব্যাপার। অনেক পিতা এ চরম লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য, আবার অনেকে দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠাবাধ করতো না।

দাসপ্রথা: প্রাচীনকাল থেকেই আরব সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। শুধু আরব নয়, সমকালীন সমগ্র বিশ্বেই দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মানুষ মানুষের প্রভু, মানুষ মানুষের দাস। বাজারে পণ্যদ্রব্যের মতো শৃঙ্খলবদ্ধ করে তাদের বিক্রি করা হতো। বিভিন্ন যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসা কিংবা জোরপূর্বক ধরে আনা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলা পরিয়ে দেয়া হতো। কখনো বা পরিশোধে অক্ষম ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতার ক্রীতদাসে পরিণত হতো। আবার অনেক সময় জুয়া খেলায় অনবরত হারতে হারতে ব্যক্তিটি বিজয়ী লোকের ক্রীতদাস হয়ে যেত। এভাবে ক্রীতদাস প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। দাস-দাসীদের সামাজিক ও ব্যক্তি অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। মনিবের ইচ্ছাই ছিল সবকিছু। এমনকি বিয়ের অধিকারও তাদের ছিল না। কেউ যদিও বা বিয়ের অনুমতি পেত, তবে তার সন্তানের মালিক হতো মনিব। সামান্যতম অপরাধেও দাসদের নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হতো। তাদের দুরবস্থা সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন- "ভৃত্যই হোক আর ভূমিদাস হোক, তাদের ভাগ্যে ক্ষীণ আশা তথা এক কণা সূর্যরশ্মিও কবরের এদিকে অর্থাৎ ইহজীবনে জুটত না।"

সুদপ্রথা: জাহিলী যুগের সমাজব্যবস্থায় সুদ ছিল শোষণের হাতিয়ার। সুদের পরিমাণ ছিল কখনো কখনো একশ ভাগ; আবার বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে স্থানভেদ দুশ ভাগ পর্যন্ত। প্রাক্ ইসলাম যুগে আরবে ইহুদিরা সুদের ব্যবসায় করতো। তারা দরিদ্র আরবদের থেকে এত উচ্চহারে সুদ আদায় করতো, অনেক সময় ঋণগ্রহীতা উচ্চহারে সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হতো। সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে ঋণগ্রহীতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সাথে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও ঋণদাতা জোর করে নিয়ে যেত।

ব্যাভিচার : ব্যভিচার বেহায়াপনা আরব সমাজে একটি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যভিচারের মাত্রা এত অধিক ছিল, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে অন্য লোকের সন্তান স্বগর্ভে ধারণের অনুমতি দিত। পিতার মৃত্যুর পর সন্তানরা বিমাতাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতো। একই সময়ে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকত। অনেক সময় ভ্রাতা ভগ্নি এবং সৎমা ও পুত্রের মাঝে বিয়ে সংঘটিত হতো। সামাজিক অনাচার ব্যভিচার, নৈতিক অধঃপতন, লাম্পট্য, চরিত্রহীনতা, মদ্যপান, জুয়া, লুটতরাজ, নারীহরণ, কুসীদ প্রথা প্রভৃতি নানা অব্যবস্থায় আরব সমাজ কলুষিত ছিল।

কুসংস্কার : কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে কুসংস্কারের বশবর্তী আরবরা তীরের সাহায্যে দেব মূর্তির সাথে পরামর্শ করে নিত। কোনো লোক মারা গেলে তার উট কিংবা ঘোড়া তার কবরের পার্শে এ বিশ্বাসে বেঁধে রাখা হতো, মৃতব্যক্তি কোনো এক সময় কবর থেকে উঠে কবরের পাশে বেঁধে রাখা সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে অজ্ঞাত গন্তব্যে যাত্রা করবে।

নিষ্ঠুরতা : জাহিলী যুগের আরব সমাজ ছিল নিষ্ঠুরতায় ভরপুর। অভিজাত আরবরা নিছক খেলাচ্ছলে নারীদের ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দিত। এতে হতভাগা নারীর মৃত্যু হলে তা প্রত্যক্ষ করে তারা আনন্দ উল্লাস করতো। কন্যা সন্তানদের তারা জীবন্ত কবর দিত এবং হাসতে হাসতে তারা একে অপরকে খুন করতেও দ্বিধা করতো না।

আভিজাত্য ও অহংকার : সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সব মানুষের মর্যাদাই আল্লাহর কাছে সমান। অথচ জাহিলী যুগে আরবের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মানুষকে বহু দলে বিভক্ত করে রেখেছিল। গরিব, অসহায় লোকদের প্রতি ছিল তাদের চরম ঘৃণা। অহংকার, আত্মম্ভরিতা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কারণে তাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ প্রকট আকার ধারণ করেছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আরবের ভৌগোলিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। আরব উপদ্বীপের জমি মরুময় ও অনুর্বর হওয়ায় তা কৃষিকাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। সামান্য যে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হতো প্রয়োজন তুলনায় তা খুবই নগণ্য ছিল। তাই আরববাসীদের সর্বদা জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত থাকতে হতো। মরুবাসী বেদুইনরা ব্যবসায-বাণিজ্য, শিল্প কারুকার্য বিংবা ভূমিকর্ষণ তাদের মর্যাদা হানিকর বলে মনে করতো। এজন্য তারা পশুপালন, শিকার ও দস্যুবৃত্তিকে জীবিকা নির্বাহের পন্থা হিসেবে বেছে নেয়। আরবের কয়েকটি অর্থনৈতিক শ্রেণী হলো:

গরিব যাযাবর: গরিব যাযাবর আরববাসীর আর্থিক অবস্থা ছিল সবচেয়ে বেশি শোচনীয়। পশুচারণ ও লুণ্ঠন করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। যাযাবররা এতই হত দরিদ্র ছিল যে, দিন এনে দিন খেত। ১০০০-এর বেশি সংখ্যাজ্ঞান তাদের ছিল না।

কুসীদজীবী ইহুদিঃ তৎকালে আরবে ধনী বণিকশ্রেণি ইহুদিরা সুদের ব্যবসা করতো। তারা কখনো কখনো শতকরা একশ, দেড়শ বা দু'শ গুণ পর্যন্ত সুদ নিত। সুদী কারাবারের নিয়মাবলি এতই জঘন্যতম ছিল যে, ঋণগ্রহীতা অনেক সময় সর্বস্বান্ত হয়ে যেত। চক্রবৃদ্ধি হাতের সুদের প্রচলন থাকায় গ্রহীতার পক্ষে কোনো দিনই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হতো না। মহাজন সুদের টাকার বিনিময় স্বরূপ ঋণগ্রহীতার ঘরবাড়ি, স্ত্রী, সন্তান এমনকি স্বয়ং খাতককেই তার দাস হিসেবে করায়ত্ত করতো।

কারিগর শ্রেণিঃ পৌত্তলিক আরবে কারিগর হিসেবে পরিচিত একশ্রেণির পেশাজীবী মানুষ ছিল। তারা হচ্ছে মূর্তি নির্মাতা শ্রেণি। আরবদের পূজ্য সকল মূর্তি এরাই নির্মাণ করতো। সমাজে এদের বেশ সম্মান ছিল। পৌত্তলিকদের ছাড়া ইহুদি, খ্রিষ্টানরাও মূর্তি তৈরি করতো। কাজেই তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিল।

শহরকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী : শহরবাসী আরবগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। প্রাক ইসলামী যুগে মক্কা বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্র উত্তর ও দক্ষিণ আরবের পথে বিদেশের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনে বিপুল অর্থ উপার্জন করতো। মক্কা ও মদিনার সম্পদ সমৃদ্ধিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবদানই সর্বাধিক। রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রথমা স্ত্রী বিবি খাদিজাতুল কুবরা (রা) এ সময়কার মর্যাদাসম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন।

মক্কাকেন্দ্রিক ব্যবসাঃ প্রাকইসলাম যুগে হিজাযের প্রধান তিনটি নগরী- মক্কা, মদিনা ও তায়িফ খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। দক্ষিণ হিজাযের নিম্নভূমিতে লোহিত সাগর থেকে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত মক্কা নগরী ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই অন্যতম প্রধান ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। কাবা শরীফের ধর্মীয় গুরুত্ব, উকায মেলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মক্কা নগরী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। মক্কার প্রায় ২০০ মাইল উত্তরে মদিনা শহর অবস্থিত। মদিনার সাথে ইয়েমেন ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথ সংযুক্ত ছিল।

তায়িফকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থাঃ সে সময় তায়িফ ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে তায়িফে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য বিশ্বের বাজারে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো। মক্কার প্রায় ২০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মদিনা ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্যপথের সাথে সংযুক্ত ছিল। ভূমির উর্বরতার জন্য মদিনায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। সে সময় এখানকার খেজুর একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল হিসেবে সুপরিচিত ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	আরবের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করুন।		
বেদুইন কারা?	আরবের প্রধান কৃষি পণ্যের নাম লিখ।	মক্কার অর্থনৈতিক নিদর্শন কী কী ?	কোন কোন দেশের সাথে আরবের ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় ছিল?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) এর আগমনের পূর্বে আরবের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল বিপর্যস্ত। পুরুষরা যেমন একাধিক স্ত্রী, উপপত্নী, দাসদাসী রাখতে পারত, তেমনি নারীরাও একাধিক পতি রাখতে অথবা তালাক দিতে পারত। শুধু তাই নয়; ভাই বোনো বিয়ে এবং বিমাতাকে বিয়ে করার কুপ্রথাও তাদের মাঝে চালু ছিল। দাস-দাসীর উপর অত্যাচার, শ্রমিকের প্রতি অবিচার, ব্যভিচার, অনাচার এত সম্প্রসারিত হয়েছিল যে, সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ ও পারিবারিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল। উচ্চহারে সুদ গ্রহণ আরবদের নিকট কোনো দূষণীয় ব্যাপারে ছিল না। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে মহাজন ঋণগ্রহীতার স্ত্রী ও সন্তানদের হস্তগত করে দাসদাসীরূপে বিক্রয় করতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মহানবীর আগমনের পূর্বে আরবে প্রায় কতটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়

ক. ১৭০০ খ. ২৭০০০

গ. ৭০০০ গ. অগণিত

২. জাহিলী যুগে কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হত-

ক. লজ্জার কারণে খ. খাদ্যের অভাবে

গ. সামাজিক বিড়ম্বনায় গ. ক, খ ও গ

৩. আরবে ব্যাপকহারে সূদ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল কোন সম্প্রদায়?

ক. কূরাইশ খ. খ্রিষ্টান

গ. ইহুদী গ. ক, খ ও গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বক্তৃতায় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জামিলা বলেন, "নারীর উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। আজো মেয়ের জন্মে অনেক বাবা- মা মন খারাপ করে থাকেন। এসব হীনমন্যতা ও অশিক্ষার কুফল মাত্র। আসুন দেশ ও সমাজের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক সুদ, ঘূষ ও মাদক দ্রব্যের বিলোপ সাধনের পাশাপাশি নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সোচ্ছার হই।

(ক) স্থলদস্যু কারা? ১

(খ) আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানকে কেন জীবন্ত কবর দিত? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে আরবের সমাজিক চিত্র তুলে ধরুন। ৩

(ঘ) চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ আরবদের জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-২.৫ জাহেলি যুগে আরবের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাহিলী সমাজের ধর্মীয় অবস্থাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জাহিলী সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরবের বিখ্যাত কাব্যমালা সাবায়া মুআল্লাকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**পৌত্তলিকতা, মূর্তিপূজা, ত্রিত্ববাদ, কন্যা শিশুর জীবন্ত হত্যা, কুসংস্কার উকাজ মেলা, সাবায়া মুআল্লাকা ও হানিফ সম্প্রদায়**

ধর্মীয় অবস্থা

ধর্মীয় পাপাচার আর সামাজিক অনাচারের মিশ্রণে আরবে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। একত্ববাদের স্থলে বহু ঈশ্বরবাদ আরব সমাজকে চরম অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়। এ সময় আরবে মোটামুটি চার ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসসম্পন্ন লোকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যথা- ইহুদি, খ্রিস্টান, মূর্তিপূজক ও হানিফ সম্প্রদায়।

ইহুদিবাদ :

ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে হিমারীয় রাজা আবু কাদির আসাদ দক্ষিণ আরবে ইহুদি ধর্ম প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে রাজা যুনাওয়াস শক্তি প্রয়োগে ইহুদি মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে উত্তর আরবের বিভিন্ন এলাকায় বনু নযির, বনু কোরায়যা এবং মদিনার উপকণ্ঠে বনু কায়নুকা প্রভৃতি ইহুদি উপনিবেশ ওঠে। ইহুদিরা অজ্ঞতাবশত জাহোবাকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মনে করতো। তারা হযরত মুসা (আ.)-এর শিক্ষা ভুলে গিয়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। খোদায়ী বিধানের সাথে তারা নিজেদের মনগড়া বিধান যুক্ত করে।

খ্রিস্ট্রবাদ :

হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর রাসূল। তিনি তাঁর উম্মতকে এক আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেয়ার পর তাঁর উম্মত অজ্ঞতাবশত একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। তারা হযরত মরিয়ম (আ.)-কে আল্লাহর স্ত্রী, ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহসহ তিন স্রষ্টায় বিশ্বাস শুরু করে (*নাঊযু বিল্লাহি-মিন-যালিক*)। ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় দু'জন নবীর উম্মত হয়েও তারা নবীর বিশ্বাস রদপূর্বক নতুন মতবাদ চালুর মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাসে অনাচারের সৃষ্টি করে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে তারা প্রত্যেকেই দাবি করতো, সর্বশেষ নবী তাদের গোত্র থেকে আগমন করবেন। ইহুদি খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই একে অন্যের বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্বেষ ছড়াতো। আল কুরআনে তাদের বিবাদের বর্ণনা এসেছে এভাবে-"ইহুদিরা বলত নাসারারা (খ্রিস্টান) সত্যের ওপর নেই; অন্যদিকে নাসারারা বলত ইহুদিরা সত্যের ওপর নেই, অথচ তারা উভয় সম্প্রদায়ই কিতাব অধ্যয়ন করতো।

পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজা :

ইহুদি-খ্রিস্টানদের ছাড়া আরব দেশে ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই কাবা গৃহকে পবিত্র স্থান মনে করা হতো। বিশ্বের বিভিন্ন জনপদ থেকে লোকেরা কাবায় হজ্জ করতে আসত। আরবরা কাবা গৃহে বিভিন্ন

গোত্রের পূজ্য ৩৬০টি মূর্তির অবয়ব স্থাপন করে সেগুলোর পূজা করতো। এ সকল মূর্তির মধ্যে পূর্ববর্তী নবী হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ঈসা ও মরিয়মের মূর্তিও ছিল। এছাড়া লাত, মানাত, ইয়াগুস, নাসরও ছিল অন্যতম প্রধান প্রধান মূর্তি। মনুষ্যাকৃতির হোবল ছিল কাবাঘরে স্থাপিত প্রধান বিগ্রহ।

কোনো আরব অনারব নয়, কোনো স্থানকালের জন্য নয়; বরং কুসংস্কারের সব জাল ছিন্ন করে তাওহীদের বাণী প্রচার করার জন্যই মহানবী (সা.) মক্কানগরীতে আবির্ভূত হন। তিনি অনন্ত কল্যাণ ও আপসহীন তাওহীদের প্রতীক। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি যথার্থই বলেন- The stage was set the moment was psychological, for the rise of a great religious and national leader. এ সময় মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল এবং সময়ও ছিল মনস্তাত্ত্বিকতাপূর্ণ।

জাহিলিয়া যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তারা অধঃপতনের সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 'তোমরা অগ্নির অতল গহবরে নিমজ্জিত ছিলে।' পরিবেশ-পরিস্থিতি একজন মহান পুরুষের আবির্ভাবের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল, সময়টাও ছিল মনস্তাত্ত্বিকতাপূর্ণ। অবশেষে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়ে আরবগণকে এক মহান ধর্মের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেন।

হানিফ সম্প্রদায় :

এমন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও আরবের কতিপয় লোক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্র দ্বীন পালন করতেন এবং কোনো প্রকার মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করতেন না। পৌত্তলিক আরবে তারা 'হানিফ' নামে পরিচিত ছিলেন। বিবি খাদিজার চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফল, উমাইয়া বিন আবিস সালত, আওস বিন সাওদা, কবি যুহায়র প্রমুখ বিশিষ্ট আরববাসী ছিলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হানিফ সম্প্রদাভুক্ত। আরব তথা সমগ্র বিশ্বের নৈরাশ্যজনক ধর্মীয় কোনো এক ঐশ্বরিক ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের পূর্বাভাস সূচনা করেছিল। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন- Never in the history of the world was need so great, the time so ripe for the appearance of a deliverer. অথ্যাৎ "পৃথিবীর ইতিহাসে এ পরিপক্ব সময়ের মতো কোনো কালেই একজন উদ্ধারকারীর প্রয়োজনীয়তা এত বেশি অনুভূত হয়নি।"

সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রাক্ ইসলাম যুগে আরবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষপদ্ধতি অথবা সুরুচিপূর্ণ মার্জিত জীবনধারা গড়ে ওঠেনি। মক্কা, মদিনা ও অন্যান্য কয়েকটি বর্ধিষ্ণু শহরের অধিবাসীরা ব্যতীত আরবের অধিকাংশ লোকই মূর্খ ও নিরক্ষর ছিল। এতদ্সত্ত্বেও অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে তারা ইসলামপূর্ব যুগের প্রচুর লোকগাথা, প্রবাদ, লোকশ্রুতি সংরক্ষণে সক্ষম হয়। তাদের সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। খতিব (বক্তা), শায়ির (কবি) এবং নাস্সাব (বিভিন্ন গোত্রের বংশ পরিচয় বা কুলজী বিশারদ।)

প্রবাদ বাক্য :

প্রবাদ বাক্য ছিল আরব সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান দিক। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বাস্তব জ্ঞানের পরিস্ফুটন ঘটেছিল এ সকল প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে। প্রবাদ ও গদ্য রচনা গীতিকাব্যের তুলনায় যদিও অপ্রতুল ছিল, তা সত্ত্বেও বিখ্যাত পণ্ডিত আল হাকিমের (লোকমান) রচনায় আরবি প্রবাদ বাক্য সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। সে সময় বহু বিদিত আরবি প্রবাদ ছিল- "সৌন্দর্য তার জিহবার বাচনশীলতার মধ্যে নিহিত।" বুদ্ধিমত্তা তিনটি বস্তুর ওপর আপতিত হয়েছে- "ফরাসিদের মগজে, চীনাদের হস্তে ও আরবদের জিহবায়"।

গীতিকাব্য ও বিষয়বস্তু :

আরব সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন আরবি গীতিকাব্য বা কাসিদা সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয় সম্পদ। বংশ গৌরব, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যুগের বিবরণ, যুদ্ধের ঘটনা, উটের বিস্ময়কর গুণাবলি, প্রতিপক্ষের লোকদের বদনামসূচক

তীরবিদ্ধ কথামালা ছাড়াও নারী, নারীর সৌন্দর্য, প্রেম, যৌনজীবন সম্পর্কিত নগ্ন কথামালা, নারী-দেহের সৌন্দর্যের বর্ণনা, যুদ্ধের বিবরণ, রণসংগীত, ব্যঙ্গোক্তি, বংশগৌরব সম্পর্কিত গীতিকাব্য রচনা করা হতো। আরবরা যে নির্ভীক বীর, অতিথিপরায়ণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল এবং কাপুরুষের মতো মৃত্যুভয়ে ভীত ছিল না, সে সম্বন্ধে আমরা তাদের কবিতা থেকেই অবগত হতে পারি।

কবি ও তাদের মর্যাদা :

আরব কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে ইমরুল কায়েস, তোরফা বিন আবদ, আনতারা বিন শাদ্দাদ, আমর বিন কুলসুম, হারেস, লবিদ বিন রবিয়া, কাব বিন যুহায়র প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রত্যেক গোত্রেরই আলাদা কবি থাকতেন। এ গোত্রীয় কবি ছিলেন গোত্রের মর্যাদার প্রতীক। সকলে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। সমাজে কবিদের অতিমানবের মর্যাদা দেয়া হতো। তাদের কবিতায় উচ্চমানের সাহিত্য অলঙ্কার নিহিত ছিল।

বিনোদন :

জাহিলী যুগে আরবরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিনোদনমূলক কর্মে অংশগ্রহণ করতো। উট ও ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা আরবদের নিকট খুবই প্রিয় ছিল।

গদ্য সাহিত্য রচনা :

লিখন পদ্ধতির বিকাশের অভাবে জাহিলী যুগের আরবে গদ্যসাহিত্য রচনায় সমৃদ্ধি লাভ করেনি। তবে বংশ বৃত্তান্ত, গোত্রীয় কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস সংবলিত কিছু গদ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল। কাব্যগাথার মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে আরবরা নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতো। ইতিহাস চেতনা তাদের মধ্যে এতই তীব্র ছিল যে, পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাস কিংবা বিশ্ব ইতিহাস রচনা তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সূচিত হয়েছিল।

উকায মেলা :

জাহিলিয়া যুগে প্রতিবছর নির্ধারিত সময়ে মক্কার অদূরে উকায নামক স্থানে একটি বাৎসরিক মেলা বসত। এখানে খ্যাতনামা আরব কবিদের মধ্যে কবিতা পাঠের আসর বসত। এখানে বিভিন্ন বিষয় যেমন- কাব্যগাথা, বীরত্ব ও বাগ্মিতার প্রতিযোগিতা হতো এবং শ্রেষ্ঠদের পুরস্কৃত করা হতো। এখানে গান বাজনা, নৃত্য প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হতো। অধ্যাপক পি.কে.হিট্টি এটিকে 'Ukaz fair was the Academic franchise of the Arabs- বলে অভিহিত করেন।

সাবয়া' মুয়াল্লাকা :

আরবের ওকায মেলায় সাহিত্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা কবিতা নির্বাচন করা হতো। প্রতি বছরের নির্বাচিত সেরা কবিতাটি কাবা-গৃহের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। 'মুয়াল্লাকা' অর্থ- ঝুলন্ত। এ ঝুলানোর কারণে এ কবিতাগুলোর নাম 'মুয়াল্লাকা' হয়েছে। এরকম সাতটি কবিতা বা 'সাবয়া মুয়াল্লাকা' সাহিত্যজগতে এক অমূল্য রত্ন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এছাড়াও দিওয়ানে হামাসা, কিতাবুল আগানী ও আল মুফাযিলাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

জাহিলিয়া যুগে আরবদের প্রশংসনীয় দিকসমূহ :

জাহিলিয়া যুগে আরবের কয়েকটি গোত্র ছাড়া প্রায় সকল স্থানের আরবগণই ছিল অশিক্ষিত ও সভ্যতা বিবর্জিত। তাদের জীবন ছিল বন্য প্রাণীয় মতো বর্বরতায় পূর্ণ। তবে তাদের জীবনে কিছু কিছু প্রশংসনীয় দিক ছিল যার বিবরণ নিম্নরূপ-

জাহিলী যুগের আরবগণ ছিল কষ্টসহিষ্ণু, নির্ভীক ও চির সংগ্রামী। মুরুময় রুক্ষ আরবে জীবনযাপন উপযোগী খাদ্য ও পানীয়ের বড় অভাব ছিল। বাঁচার জন্য তারা প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতো। আরবগণ ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয়দান এবং অত্যাচারিতকে রক্ষা করা তারা তাদের কর্তব্য বলে মনে করতো। আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য তারা নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিত। পরবর্তীকালে তাদের এ গুণাবলিকে লালন করার জন্য মহানবী (সা.) বলেন, "অন্ধকার যুগের আদর্শ গুণাবলির প্রতি লক্ষ কর এবং সেগুলোকে ইসলামের কাজে লাগাও। অতিথিকে আশ্রয় দাও, এতিম শিশুর প্রতি সদয় হও এবং আশ্রিতদের সাথে সদয় ব্যবহার কর।" জাহিলিয়া

যুগের আরবগণের একটি প্রশংসনীয় গুণ ছিল অতিথিপরায়ণতা। অতিথির থাকা খাওয়া এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হতো না।

জাহিলিয়া যুগে আরবগণ কবিতা রচনা ও বক্তৃতায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। কবিতার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশ পেত। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "কাব্যপ্রীতিই ছিল বেদুইনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ।" তাদের কবিতাগুলো 'কাসিদা' নামে খ্যাত ছিল। তিনি আরো বলেন, "এ কাসিদাগুলো ছন্দ এবং বিশদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'কেও অতিক্রম করেছিল।"

শিক্ষার্থীর কাজ	আরব সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস কেমন ছিল?

কে আরবে ইহুদী ধর্মের প্রচলন করেছিল ?	খ্রীস্টানদের তিনজন ইশ্বরের পরিচয় কী কী ।	হানিফ সমপ্রদায়ের তিনজন ব্যাক্তির নাম কী?	পৌত্তলিক বিশ্বাসের মূল বিষয় কোনটি?

সারসংক্ষেপ :

জাহিলী যুগের আরব সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ন্যায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনেও নানাবিধ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান ছিল। একদিকে ইহুদী ও খ্রীস্ট্রানরা মুসা ও ঈসা আ: এর শিক্ষাকে ভূলে গিয়ে এক আল্লাহর পরিবর্তে একাধিক ঈশ্বরের ইবাদাত করতে থাকে। খ্রীস্ট্রানরা স্বয়ং রাসুলকেই আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। নিজেদের খুশিমত রদবদল করতে গিয়ে ধর্মীয় নেতারা সমাজের শোষক শ্রেণীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে আরবরা কাব্য সাহিত্যে চর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করলেও তার বিষয় বস্তু ছিল অশ্লীলতায় পূর্ণ। নারীর রূপ বর্ণনা আর স্বজাতিকে যুদ্ধে উদ্ধুদ্ধ করতে তারা কাব্য রচনা করত। সাবাআ' মুয়াল্লাকা ঐ যুগের আরবের বিখ্যাত কবিতাগুচ্ছ, যা আজো বিশ্ব সাহিত্য সম্ভারের এক উজ্জল সম্পদ বটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবে ইহুদী ধর্ম প্রবর্তন করেন কে?
   ক. আবু কাদির আসাদ খ. আবু উবায়দা
   গ. আবুল ফজল ঘ. আবু হাফস

২. আরবদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল ছিল-
   ক. প্রাচীন গোত্রতান্ত্রিক শাসন খ. গোত্র-প্রীতি
   গ. বংশ-গৌরব ঘ. আভিজাত্য

৩. সাবাআ' মুয়াল্লাকায় কতটি কবিতা ছিল?
   ক. সাত খ. সাতাশ
   গ. সাতশত ঘ. সতের

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সমসেরাবাদ গ্রামের ইব্রাহিম সাহেব প্রতি বছর শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রতিযোগিরা বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় যারা ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান লাভ করে তাদেরকে আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই আয়োজনের ফলে ঐ এলাকার অধিবাসীরা শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

(ক) দারুন নাদ্ওয়া কী? ১

(খ) জাহিলী যুগের আরবদের ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা দিন। ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিযোগিতার সাথে জাহেলি যুগের কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

(ঘ) অনুরূপ প্রতিযোগিতা তোমার সমাজে কী ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে? আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১	: ১. (খ)	২. (ঘ)	৩. (ঘ)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২	: ১. (ক)	২. (ক)	৩. (খ)	৪. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩	: ১. (ক)	২. (গ)	৩. (গ)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪	: ১. (ক)	২. (ঘ)	৩. (ঘ)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫	: ১. (ক)	২. (খ)	৩. (ক)	